নবম পরিচ্ছেদ

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

টাঙন-তীরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাঁও, কোড়া, মাল, মালপাহাড়ি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তফশিলি জাতিভুক্ত রাজবংশি, পলিয়া, দেশি, নমশূদ্র, তিওর প্রভৃতি সম্প্রদায় এই অঞ্চলে গোষ্ঠীপ্রসার করেছে। উৎসগত দিক থেকে এ অঞ্চলের মুসলমানেরা দুটি ভাগে বিভক্ত:

১) নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুরে এঁদের আধিক্য।

২) শেরশাহি-বাদিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। পুরাতন মালদহ, যাত্রাডাঙা, মুচিয়া ও গাজোলের কিছু জায়গায় এঁদের দেখা যায়।

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের তিন চতুর্থাংশ অধিবাসী তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির মানুষ। উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্লক-সদরে বাস করেন। কিন্তু গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই তফশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ধরনের লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার এদের মধ্যে জিইয়ে আছে। এর পেছনে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্কারই মূলত দায়ী। উপজাতি শ্রেণির লোকেরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে লোকবিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল। একই অবস্থা দেখা যায় রাজবংশি, পলিয়া, মুসলমান ও অন্যান্য

অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যেও। ভূত-প্রেত ও প্রেতাত্মাকেন্দ্রিক বিভিন্ন লোকসংস্কার এঁদের চিকিৎসা- ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে এখানকার সমাজের এক শ্রেণির মানুষ ওঝা বা গুনিনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মীরা গেলেও এইসব ওঝা-গুনিনের প্রভাব লুপ্ত হয়ে যায়নি।

তেলপড়া, জলপড়া, মন্ত্রপূত সরষেপড়া ইত্যাদি লোকবিশ্বাসের প্রভাব এ অঞ্চলের মানুষের মনের গভীরে শিকড় বিস্তার করেছে। এমন বিশ্বাসকে পুঁজি করে অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকও দু-পয়সা কামিয়ে নিচ্ছেন। গাজোলের করলাভিটার এমনই এক চিকিৎসক একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, তেলপড়া ও নিমডাল দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে রোগীদের 'সারিয়ে তোলেন'।

টাঙন অববাহিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু চমকপ্রদ লোকসংস্কার লক্ষ করা যায়। অনেক গ্রামে বট ও পাকুড় গাছকে পাশাপাশি রোপণ করে বটকে বর ও পাকুড়কে কনে সাজিয়ে তাদের বিয়ের আয়োজন করা হয়। পংক্তিভোজে আমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। রীতিমতো ঠাকুর-পুরুত ডেকে এই বিয়ের অনুষ্ঠান চলে। কোথাও কোথাও ব্যান্ডেরও ব্যবস্থা করা হয়। এতে গ্রাম্য মাতব্বরদের আভিজাত্য প্রকাশ পায়।

বৃষ্টি না-নামলে ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করেন সম্ভ্রান্ত চাষিরা। ব্যাঙের বিয়ে দিলে আকাশে মেঘ জমতে পারে ও বৃষ্টি নামতে পারে এই বিশ্বাস পোষণ করেন অনেকেই। বৃষ্টির আহ্বানে সমবেত নমাজেরও চল আছে।

'লোঠাচান' টাঙন-তীরের এক বিশেষ লোকসংস্কার। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি হলে কৃষকদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। গ্রামের যুবকেরা সে সময় লুকিয়ে অন্যের ভাঁড়ারের খাবার খেয়ে ফেলে। এতে ওই বাড়ির যুবকও জড়িয়ে থাকতে পারে। এই সময় সাধারণত গৃহস্থের ঘরে আম, কাঁঠাল, তালবড়া ও পিঠে মজুত থাকে। এসব চুরি করে খাওয়ার পরে গৃহস্থ যত গালিগালাজ করবে ততই বৃষ্টি আসন্ন হবে। যুব সমাজও এসময় কর্মহীন হয়ে পড়ে।

কালীপুজোর পরের দিন গরুর মাথায় তেল সিঁদুর দিয়ে গো-ডহরা পালন করেন এই এলাকার মানুষ। গরুকে খই-কলা খেতে দেওয়া হয়। এতে গৃহলক্ষ্মীকে বরণ করার পাশাপাশি গোস্বাস্থ্য ভালো রাখার কামনা করা হয়। গৃহস্থের বিশ্বাস, এর ফলে গোদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। গ্রামে সন্তান জন্মালে বাঁশের চোঁচা দিয়ে মায়ের নাড়ি কাটার সংস্কার এখনো আছে। নবজাতকের মুখে কোলেস্ট্রামের বদলে প্রথম ছাগদুগ্ধ পান করানোর রেওয়াজ আছে। তবে ধীরে ধীরে আজকাল মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে।

টাঙনে মাছ ধরার সময় প্রথম মাছটিকে অনেক ধীবর পুনরায় নদীতেই ছেড়ে দেন। এতে বেশি মাছ ওঠার সম্ভাবনা থাকে বলে তাঁদের বিশ্বাস। টাঙনকে গঙ্গার তুল্য ভেবে স্নানের আগে খানিকটা জল মাথায় ছিটিয়ে নেন স্নানার্থীরা। টাঙনের বাইচে অংশ-নেওয়া পুরুষেরা নারীদের চোখে সৈনিকের মর্যাদা পায়।

তেনাপির শ্মশানমন্দিরের কাছে একটি গাছে অনেকেই ছিন্নবস্ত্র (তেনা) টাঙিয়ে রাখেন। তাঁদের বিশ্বাস, এখানে বস্ত্রখণ্ড টাঙিয়ে যা-কামনা করা যায় তা-ই প্রাপ্তি হয়। কৃষকদের মধ্যে লাঙল ধুয়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে লাঙল পুজো করারও চল আছে।

গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুরের কয়েকটি গ্রামে মন্ত্রশক্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মনসাপুজো উপলক্ষে শ্রাবণ মাসে কয়েকজনের হাত মন্ত্রপুত করে বিষ চালনা করা হয়। তাদের কাঁপতে-থাকা হাত টানবার জন্য দুটি গোষ্ঠী মন্ত্রপাঠের সাহায্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। আদিবাসীদের মধ্যেও এ ধরনের প্রতিযোগিতার চল আছে। মন্ত্রশক্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে ছাগল, ভেঁড়া, শুয়োর ও মুরগি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।

বিজ্ঞানের পাখনায় ভর করে আমরা একুশ শতকে প্রবেশ করেছি। ভোগবিলাসের আবর্ত ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। কিন্তু সমাজে ডাইনি সন্দেহে খুনের উন্মাদনা আজও অব্যাহত।

সমাজে পরছিদ্রান্বেষী সন্দেহ অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। কারও মুখ দেখলে দিনটা খারাপ যাবে কিংবা কারও নজরে কোলের শিশু অসুস্থ হয়ে পড়বে— এ ধারণা তথাকথিত অনেক শিক্ষিতই আজও পোষণ করেন। তবে

তা একটা গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই ধারণাকে কেন্দ্র করে খুনের পথ বেছে নিতে দ্বিধা করে না আদিবাসীরা।

আদিবাসী সমাজের অপদেবতার নাম বোঙা। আদিবাসীদের ধারণা, এই বোঙার প্রভাব যার উপর পড়ে সে ডাইনি বা ফুসকিন হয়ে যায়। এর ফলে সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। তবে এই ক্ষমতার সাহায্যে সে কারও ভাল কাজ করতে পারে না। কেবল অনিষ্টই করতে পারে। এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ডাইনি বা ফুসকিন আদিবাসী সমাজের যে-কোনও ব্যক্তিকে 'খেয়ে ফেলতে' পারে। কী ভাবে 'খেয়ে ফেলে' বা ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় তা নিয়ে আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাসটা মোটামুটি এক। যার উপর ডাইনির নজর পড়ে তার অসুস্থতা দেখা দেয়। এবং এই অসুস্থতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেই অসুস্থ ব্যক্তির 'কলেজা' অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডটি মন্ত্রের সাহায্যে বের করে এনে অন্ধকার রাতে মাটির হাঁড়িতে রান্না করে খায় ডাইনিরা। মন্ত্রের সাহায্যেই তারা নাকি অসুস্থ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের জায়গায় গামছা বা কোনও বস্ত্রখণ্ড পুরে দেয়। এর পর অসুস্থ ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

না, এই ধারণার পেছনে ন্যূনতম বিজ্ঞান নেই। অথচ, ডাইনি সন্দেহের বলি হয়ে চলেছেন বহু নিরপরাধ আদিবাসী। ডাইনিদের হত্যা করলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে, সামাজিক শান্তিও ফিরে আসে বলে আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাস। অনেক শিক্ষিত আদিবাসীও এ ধারণা পোষণ করেন। যদিও ব্যক্তি-স্বার্থ ছাড়া শিক্ষিত আদিবাসীরা নিরক্ষরদের সঙ্গে খুব কমই ওঠা-বসা করেন।

কিন্তু কেন এই ডাইনি-প্রথা আজও সমাজে টিকে আছে? আইনি কঠোরতা সত্ত্বেও ডাইনি অপবাদে আদিবাসী রমণীদের একের পর এক খুন হতে হচ্ছে কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা আদিবাসী সমাজকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু ডাইনি সন্দেহে পৈশাচিক হত্যালীলার মূল কারণ করুণ চিকিৎসা-পরিষেবা। আদিবাসী-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রের যথেষ্টই অভাব আছে। নুন আনতেই যাদের পান্তা ফুরোয়, চিকিৎসার অভাবে তাদের ঘরে শুয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনও উপায় দারিদ্র্যজর্জর আদিবাসী গ্রামগুলিতে নেই।

অভাবগ্রস্ত আদিবাসীদের কেউ কেউ দূরবর্তী হাসপাতালে গেলেও বাইরে থেকে ওষুধ কেনার মতো সামর্থ্য থাকে না। বাধ্য হয়ে তাঁরা ঝাড়-ফুঁকের জন্য স্থানীয় 'মাহান'-এর কাছে যান। এই মাহান বা গুনিনেরা ঝাড়-ফুঁকের পাশাপাশি অনেক সময় কবিরাজি ওষুধও দিয়ে থাকেন। তাতে কোনও কোনও রোগী সেরেও যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই নিরক্ষর মাহানেরা এমন কিছু গাছ-গাছড়া প্রয়োগ করেন যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় রোগ জটিলতর আকার ধারণ করে। এমন-কী রোগীর মৃত্যুও ঘটে। কিন্তু মৃত্যুর কারণ হিসাবে কোনও মাহান বা গুনিনের প্রতি দোষারোপ করেন না আদিবাসীরা। বরং তাঁরা আরও নিশ্চিত হন যে, মানুষবেশী কোনও ডাইনি রোগীকে খেয়ে ফেলেছে।

রোগী বাঁচুক বা না-বাঁচুক, মাহানের কাছে ব্যর্থ হলে আদিবাসীরা জানগুরুর শরণাপন্ন হন। জানগুরু আসলে আদিবাসী সমাজের গনতকার। গ্রামের মোড়লও তাঁর কথাকে অব্যর্থ বলে মনে করেন। যে-কোনও এলাকার যে-কোনও জানগুরুকেই আদিবাসীরা দেবতুল্য সম্মান জ্ঞাপন করেন। লোকঠকানো চিকিৎসা ও ডাইনি চিহ্নিত করার কাজে জানগুরুরা সিদ্ধহস্ত। প্রত্যেক জানগুরুর ডেরাতেই কিছু সাকরেদ বা এজেন্ট থাকেন। এঁরা বাহ্যত আপ্যায়নকারী কিংবা অন্য এলাকার বাসিন্দার ভূমিকা নেন। পরিচয় গোপন রেখে আলাপ করতে করতে তাঁরা আগন্তুকদের সমস্যা ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা জেনে ফেলেন। এজেন্টদের সহায়তায় জানগুরুরা গণনায় বসেন। তার আগেই অবশ্য আগন্তুক-দলের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ফি আদায় করে নেন। গণনার শেষে জানগুরুরা ওই সব নামের আদ্য-বর্ণ বা তাঁদের বাসস্থানের সঙ্কেত দিতে থাকেন। অনেক সময় সন্দিগ্ধ নামও বলে দেন। সর্বস্বান্ত হলেও আদিবাসীরা জানগুরুর নির্দেশকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেন। এর পরে তাঁরা দ্বিধাহীন ভাবে খুন করতে এগিয়ে যান। তা সে নিকট আত্মীয় হোন বা গর্ভধারিণী মা-ই হোন— ডাইনি চিহ্নিত হওয়ার পর তাঁকে আর মানুষ বলেই মনে করতে পারেন না আদিবাসীরা। এই খুনের সময় তাঁরা ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেন। ডাইনি সংক্রান্ত সব কটি খুনের ঘটনা ঘটেছে কুপিয়ে বা পিটিয়ে। এই হত্যাকাণ্ডে আদিবাসীরা কখনও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন না।

আদিবাসী রমণীর মুখে কারও মরার কথা আনা নাকি চরম অশুভ। কারও অসুস্থতা দেখে যদি কোনও আদিবাসী রমণী 'সারবে না' বা 'বাঁচবে না' বলে মন্তব্য করেন তবে তাঁকে ডাইনি হিসাবে আখ্যা দিয়ে মেরে ফেলেন তাঁর পরিবারের লোকেরাই। এক্ষেত্রে জানগুরু ছাড়াই আদিবাসীরা সিদ্ধান্ত নেন। তবে শাস্তি সম্পর্কে তাঁরা তোয়াক্কা করেন না। তাই হত্যাকারীরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ডাইনি সন্দেহে খুনকে তাঁরা গৌরবের বলে মনে করেন।

ডাইনি সংক্রান্ত হত্যায় মালদহ জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত বরিন্দ এলাকা বারবারই সংবাদের শিরোনাম হয়ে ওঠে। এখানকার গাজোল ব্লক ডাইনি সংক্রান্ত হত্যায় দেশের শীর্ষে। ১৯৮৩ থেকে এ পর্যন্ত গাজোলে ডাইনি সংক্রান্ত খুনের শিকার ৫১ জন। এর মধ্যে গত কুড়ি বছরে খুন হয়েছেন ৩৮ জন। ডাইনি অপবাদে খুনের ভয়ে এখানকার ডজনখানেক আদিবাসী-রমণী আজও ঘর ছাড়া। হয়ত তাঁরা কোথাও বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন।

কিন্তু এঁরা সত্যিই ডাইনি কি না তা ভাববার মতো মানসিকতা নেই মধ্যযুগীয় বর্বরতায় আছন্ন আদিবাসীদের। তাই ফাঁসির আদেশেও তারা আদৌ ভীত হয় না। অন্য দিকে, ডাইনি সংক্রান্ত বলির নেপথ্য নায়ক জানগুরুদের মাঝে-মধ্যে পুলিশ ধরপাকড়, করলেও ছাড়া পেয়েই তাঁরা আবার বেপরোয়া হয়ে ওঠেন।

বস্তুত, আদিবাসীদের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার এমন ভাবে আঁকড়ে আছে যে, সহজে এই প্রথা রদ করা মুশকিল। আদিবাসীদের মধ্যে মূলত সাঁওতাল ও কোড়া সম্প্রদায়ের পুরুষেরা যক্ষ্মারোগে ও মহিলারা রক্তাল্পতায় ভোগেন। সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে, যোগাযোগসঙ্কুল ও বিদ্যুৎবিহীন আদিবাসী গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মীরা ঠিকমতো যান না। স্বল্পাহারে দিন অতিবাহিত হয় গ্রামবাসীদের। তাই অপুষ্টি আদিবাসী শিশুদের নিত্যসঙ্গী। সাক্ষরতা প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও আদিবাসীদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ খুব কমই নেওয়া হয়েছে। এই ইন্টারনেটের যুগে বাস করেও পশুবলির মতোই ডাইনি সন্দেহে নরবলি ঘটে চলেছে। অথচ, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিং ভারতের আদিবাসী-সমাজে নরবলি প্রথা নিষিদ্ধ করতে আইন জারি করেন।

ডাইনি-প্রথা নির্মূল করার আন্তরিক উদ্যোগের এখনও যথেষ্ট ঘাটতি আছে। কালে-ভদ্রে একদিন চিকিৎসা-শিবির কিংবা ঠাণ্ডা ঘর থেকে বক্তা এনে আলোচনা-সভার আয়োজন করলে এই কুসংস্কার কখনও দূর করা যাবে না। ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় না-রেখে আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাসে জোরালো আঘাত আনতে হবে রাজনৈতিক নেতাদের। জানগুরুদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা দরকার জনপ্রতিনিধিদের। নইলে শুধু আইনের ভয় দেখিয়ে এই প্রথা রদ করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ আদিবাসী পুরুষ 'পচানি' বা 'হাড়িয়া' নামের এক প্রকার পানীয়তে আসক্ত। হাড়িয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে এঁরা সমাজ-সংস্কার ভুলে যান। বেশির ভাগ ডাইনি-ঘাতক নেশাসক্ত হয়েই খুন করেন।

কাজেই সার্বিক স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে গেলে তাঁদের নেশা থেকে বিরত রাখতে হবে। হাড়িয়া তৈরির প্রধান উপকরণ এক প্রকার ভেষজ মিশ্রণের গুলি খোলা বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়। এই গুলি যদি তাঁরা না-পান হাড়িয়া তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে প্রশাসন ও আবগারি বিভাগকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

অনাথ বিধবার সম্পত্তি দখলের লোভে তাঁকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে খুন করার ঘটনাও দু-একটি ঘটেছে। তবে এ ধরনের খুনের ঘটনার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। চিকিৎসার অভাবই এর প্রধান কারণ। তাই স্বাধীনতার একষট্টি বছর পরেও গ্রামের মানুষকে তুকতাক ও জলপড়ার ওপর ভরসা করতে হয়। তবে যেসব গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু আছে সেখানে ডাইনি সংক্রান্ত খুনের ঘটনা কম ঘটে। প্রত্যেকটি গ্রামে যদি ঠিকমতো চিকিৎসা-পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় তবে ডাইনি সংক্রান্ত খুনের ঘটনা নির্মূল হতে বাধ্য। একই সঙ্গে শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও রাস্তা এই তিনটি চাহিদাও পূরণ হবে।

ডাইনি ভেবে যাঁকে খুন করা হয়, তিনি যে তাঁদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ—এ কথা বিস্মৃত হয়ে যান ঘাতকেরা । বাস্তবে ডাইনি বলে কিছুই নেই। কিন্তু সে কথা বোঝাবে কে? জানগুরু বা মাহানের কাছে না-গিয়ে, দূরে হলেও, হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে। তবেই এই নির্মম সামাজিক অভিশাপকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব। নইলে এই সহস্রাব্দেও আদিবাসী-রমণীরা বাঁচার জন্য নিরাপত্তার অক্সিজেন খুঁজতে থাকবে।

গাজোলের ডাইনি-ঘটিত খুনের তালিকা [১]

ক্রমাঙ্ক	তারিখ	স্থান	নাম	মন্তব্য
১।	১৫.০৫.১৯৮৮	বাজে ঝাড়শাবল	পানি কিস্কু	
২।	২৭.০৫.১৯৮৮	ধাওয়েল	বেটিয়া হেমরম	
৩।	২৫.১২.১৯৮৮	রাজাদিঘি	কাঁদো হাঁসদা	
৪।	২৫.১২.১৯৮৮	রাজাদিঘি	দেলহো সরেন	কাঁদোর স্বামী
৫।	২৭.০১.১৯৮৯	বটতলি	ছোটকা হেমরম	
৬।	১৫.০২.১৯৮৯	হবিনগর	সাঁঝলি হেমরম	
৭।	১৫.০৩.১৯৮৯	ছয়ঘাটি	মতি মুমু	
৮।	২৮.০৩.১৯৮৯	বাঁশঝুড়ি	ফুলমণি সরেন	
৯।	১১.০৮.১৯৮৯	বেগুনবাড়ি	বড়গে মার্ডি	
১০।	০১.০৯.১৯৯০	বাবুইডাঙা	শ্যাম মুর্মু	
১১।	২৭.১১.১৯৯০	হেকরাডাঙা	পাড়ুয়া হাঁসদা	
১২।	২৯.০৫.১৯৯১	পারইল	মাইকো মুর্মু	
১৩।	০৪.০৯.১৯৯১	শ্যামনগর	সুমি মার্ডি	
১৪।	০৪.০৯.১৯৯১	শ্যামনগর	সোহরাই কিস্কু	ঘাতক সুমির ছেলের হাতে পাল্টা খুন
১৫।	০২.১১.১৯৯১	চাঁদপুর	মালোহো হেমরম	
১৬।	০২.১১.১৯৯১	পূর্ব কসবা	মংলি হেমরম	
১৭।	১৯.০৪.১৯৯২	রাজাদিঘি	বিটিয়া মুর্মু	
১৮।	২১.০৬.১৯৯২	ঝাড়শাবল	আচ্ছি টুডু	
১৯।	২১.০৬.১৯৯২	ঝাড়শাবল	অজ্ঞাত পরিচয়	আচ্ছির ছেলের হাতে পাল্টা খুন
২০।	০৯.০৭.১৯৯২	সরষাটুলি	ঝানু মুর্মু	
২১।	১৯.০৫.১৯৯৩	বটতলি	নির্মল মণ্ডল	
২২।	১০.০৬.১৯৯৩	বটতলি	দুখিনী মণ্ডল	নির্মলের স্ত্রী
২৩।	১৩.০৯.১৯৯৫	কাঞ্চনবাড়ি	সুরমা মুর্মু	খুনি ভাই-বউ ফুলমনি
২৪।	৩০.০৬.১৯৯৬	মধুডাঙা	ফুল মার্ডি	ফুলের স্বামী কৃষ্ণ কিস্কু জখম
২৫।	০১.০১.১৯৯৭	চন্দ্রাইল	ধীরেন রাজবংশী	১৭.০৫.'৯৭-এ ডোবা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার
২৬।	২৬.০৩.১৯৯৮	সিঁদুরবোনা	সুমি মার্ডি	ছেলের হাতে খুন

২৭।	২৯.১১.১৯৯৮	শহরপুর	মণি টুডু	
২৮।	০৫.০৭.১৯৯৯	বটতলি	সুমি হাঁসদা	
২৯।	২৮.১১.২০০১	মধুডাঙা	সুমি মুর্মু	২৩.০১.'০২-এ মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ উদ্ধার
৩০।	১৮.১২.২০০২	সরষাটুলি	দুলালী হেমরম	২১.১২.'০২-এ বোলবাড়ির পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার
৩১।	২৪.১২.২০০২	আলমাসপুর	হোপনি সরেন	খুনি ছেলে। ১০০ টাকায় বেচা কাটা মুণ্ড উদ্ধার (২.৬.'০৩)
৩২।	২৩.০৭.২০০৪	বুমকা	শাওনা সরেন	
৩৩।	১৯.০১.২০০৫	শালবোনা মোড়	কাজলি মার্ডি	
৩৪।	১২.০৪.২০০৫	আরাজি জালসা	সাঁঝলি মুর্মু	কাকিমার হাতে খুন
৩৫।	১৫.০৫.২০০৬	বুজুভিটা	পুর্গি সরেন	
৩৬।	০২.০২.২০০৮	সরষাটলি	রামাইত টুডু	ছেলের হাতে খুন
৩৭।	১৯.০৯.২০০৮	পিরপাড়া	রমেশ মার্ডি	
৩৮।	১১.১০.২০০৮	রঘুনাথপুর	বাহা বেসরা	

এই তালিকার বাইরেও টিয়াকাটির ইসি সরেন ও তাঁর মেয়ে লছমি টুডু, মাহিনগরের ভুলকু টুডু, কুলমুঝুড়ির খাপরো হেমরম, মুদাপুরের বাহা মার্ডি, মাঝি সরেন ও রানি কিস্কু ডাইনি সন্দেহে খুন হয়েছেন। কিন্তু ঘটনার ঠিক তারিখ জানাতে পারেননি তাঁদের পরিবারের লোকেরা।[২]

অন্য দিকে, ডাইনি সন্দেহে খুন হওয়ার ভয়ে অনেক আদিবাসী এখনও ঘর ছাড়া। রুইমারির ডোবা হেমরম, গাইকুড়ির দামধর কিস্কু ও টেলে কিস্কু, রাজাদিঘির লক্ষ্মী সরেন, নোহা সরেন ও লক্ষ্মী হাঁসদা, পাডোলের সীতা মুর্মু ও

নাসো সরেন, মিরজাদপুরের রাইমতি হেমরম, নওগাঁর মণি মুর্মু, লকড়িপিরের সখি সরেন খুনের আশঙ্কায় অন্যত্র হয়ত বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন।[৩]

তবে গ্রামে কাজের অভাবে ভিন রাজ্যের কাজে পাড়ি দিয়ে ফেরার সময় সেখানকার সংস্কৃতির প্রভাবে মানসিকতা বদলে ফেলেছেন অনেকেই। তাঁদের কেউ কেউ ডাইনি সন্দেহের পরিবর্তে অসুখ-বিসুখে চিকিৎসাকেন্দ্রের আশ্রয় নিচ্ছেন। ইদানিং গ্রামের আদিবাসী মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেতে থাকায় জানগুরুদের দাপটে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। তাঁরা সমবেত হয়ে মদ্যপ পুরুষদের নেশার ঠেক ভেঙে দিচ্ছেন। সমাজ-সংস্কারের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির এই স্বশাসিত উদ্যোগ অনেককেই প্রাণিত করছে। তাই ঠুনকো আইন বা তথাকথিত অভিযান করে নয়, ডাইনি সন্দেহে হত্যার হয়ত ইতি ঘটাতে পারেন গ্রামের ক্যামেলিয়া-দশভুজারাই।

তথ্যসূত্র :

১. ডাইনি হত্যার শীর্ষে গাজোল (প্রতিবেদন) — গৌরাঙ্গদেব ভার্মা, 'যুগান্তর' পত্রিকা, ৯ মার্চ ১৯৯৪

২. উন্নয়ন বঞ্চিত গাজোল ব্লক ডাইনি হত্যার শীর্ষে (প্রতিবেদন)— সত্যনারায়ণদেব ভার্মা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২৪ আগস্ট ২০০৪

৩. আজও ডাইনি (প্রতিবেদন) — গৌরাঙ্গদেব ভার্মা, গাজোল মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ২০০৬-'০৭ পৃষ্ঠা- ৬১